ভূমিকা

এক সময়ের ইংরেজ করদমিত্র রাজ্য কোচবিহার সাহিত্য সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। বিচিত্র সংস্কৃতির সংমিশ্রনে এই অঞ্চল উত্তর পূর্ব ভারতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। বাংলা সাহিত্যের চর্চা এই অঞ্চলে যেমন দীর্ঘদিন থেকে হয়ে এসেছে তেমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রাজন্যবর্গশাসিত কোচবিহার ছিল উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার রাজ্যটি পরবর্তী সময়ে ভারতের অর্ন্তভুক্ত হয়। তার ও কিছু পরে (১ লা জানুয়ারী ১৯৫০) কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে স্বিকৃতি পায়। আমাদের বক্ষ্যমান গবেষনার লক্ষ্য স্বাধীনোত্তর কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরম্পরা অনুসরন ও তার মূল্যায়ন। স্বাভাবিকভাবেই এই মূল্যায়ন এই অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে পূর্নতা দিতে সাহায্য করবে।

আমাদের আলোচনার **প্রথম অধ্যায়টিতে** আমরা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কোচবিহারের সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরন তুলে ধরেছি। এই অধ্যায়ে কোচবিহারের নামকরণ, ভৌগোলিক সীমা, জনপরিচিতি ও তৎকালীন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ রয়েছে। রাজন্য শাষিত কোচবিহারের রাজসভাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল অব্যাহত। এই পর্বেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্কর দেবের প্রসঙ্গটিও এসে পড়েছে। রাজকীয় চিঠি পত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রথম লিখিত নিদর্শনটির কথাও উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে কোচবিহারের বিভিন্ন রাজাদের উৎসাহে অনুদিত সাহিত্যের প্রসঙ্গ ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির বিবরনও। প্রকৃতপক্ষে এক সমৃদ্ধ সাহিত্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সূত্রেই আমরা এসে দাঁড়িয়েছি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহার সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে উত্তরণের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রাসঙ্গিক ইতিহাসটি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গেই আমরা উল্লেখ করেছি তথাকথিত বহিরাগত ও এতদ্দেশীয় মানুষের মনোজগতের দ্বিধা ও দ্বন্দের প্রেক্ষাপটটিকে। কারণ মানুষের মনের জমিটিই সাহিত্য সাধনারও বীজতলা।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রচিত কাব্য কবিতার প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে আমরা ৪০ জন কবির ৮৪ টি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছি। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিশাল সংখক কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে সকলের প্রতি সমান সুবিচার বা প্রসঙ্গটিকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা এসে গেছে। এছাড়াও নিবন্ধ গ্রন্থিত হবার সময়ে বেশ কিছু ক্ষুদ্রাকার কাব্যগ্রন্থ আমাদের সংগ্রহে এসেছে। পরিশিষ্ট অংশে এর একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে। সংখ্যায় অনেক হলেও গুনমানের দিকথেকে খুব বেশি কাব্যগ্রন্থ স্থায়ীত্বের দাবীরাখেনা বলেই মনে হয়েছে। তথাপি একটি ছোট জেলায় কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে এই বিপুল প্রসার এই অঞ্চলের বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রবনতার পরিচায়ক।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় 'স্বাধীনোত্তর কথাসাহিত্য'। কোচবিহারের মত মফস্বল শহরে যেখানে জীবন ও জগৎ সর্ম্পকে স্বাভাবিকভাবেই গভীর চিন্তা প্রত্যাশিত নয় সেখানে কথাসাহিত্যের খুব বেশী উৎকর্ষ আশা করা যায় না। তথাপি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ২৪ জন কথাসাহিত্যিকের ৪৬ টি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল এই যে অমিয়ভূষণের মত বিরল কথাসাহিত্যিক কোচবিহারে বসেই দীর্ঘ সময় ধরে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই অধ্যায়ে তার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে জীবন দে, প্রবোধ পাল, প্রদীপ রায়গুপ্ত প্রভৃতি কথাসাহিত্যিক সমন্ধে আলোচনায় এই অধ্যায়টি সমৃদ্ধ হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু স্বাধীনতার পরবর্তী 'নাটক,প্রবন্ধ ও অন্যান্য' রচনা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা যথেষ্ঠ অনুসন্ধান লব্ধ গ্রন্থগুলির মূল্যায়ন করেছি। এক্ষেত্রে, বিশেষভাবে, নাটক রচনায় ও মঞ্চাভিনয়ে কোচবিহারের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। আমাদের আলোচনায় সেই ঐতিহ্যের অনুসঙ্গি বর্তমান সময়ের

উপস্থাপনা রয়েছে সঙ্গত ভাবেই। প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই জেলায় যারা দক্ষতা দেখিয়েছেন তাদের গ্রন্থের নিবিষ্ট মূল্যায়ন আমরা করেছি। অন্যান্য প্রসঙ্গে শিশু সাহিত্যে, ছড়া, ভ্রমন সাহিত্য, চরিত সাহিত্য, স্মৃতিচারণ, রম্য রচনা, ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনাও আমরা করেছি। এ ছাড়াও কথ্য ভাষায় রচিত কিছু গ্রন্থের মুল্যায়ণ অংশে রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'কোচবিহারের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি'। এই অধ্যায়ে লোক-সংস্কৃতির যে ধারাগুলো এখনো প্রবহমান তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা তুলে ধরেছি। এই জেলার ভাওয়াইয়া লোকসংগীত, জাগের গান, ময়নামতীর গান, হেটো কবিতা, লোক নাটক, ব্রত পাঁচালী, প্রবাদ প্রবচন, লোক দেবতা প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'কোচবিহারের শিক্ষার চালচিত্র'। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন ও তার পিতা নরেন্দ্র নারায়নের সময় থেকে কোচবিহার শিক্ষা ক্ষেত্রে একেটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়নের ব্রাহ্ম ধর্ম সংশ্রব এই অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিকে গতি দিয়েছিল। তবে প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতই গনশিক্ষা বা লোকশিক্ষা ছিল অনেক দূরে। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির চিত্রটি। স্ত্রীশিক্ষা, সাক্ষরতা আন্দোলন, গ্রামীন গ্রন্থাগারের বিকাশ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে কোচবিহারের সাময়িক পত্র পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে। শ্রমসাধ্য একটি দীর্ঘ সারনী এই অধ্যায়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং যে সব সাহিত্যিক পত্রিকা স্থায়ী অবদান রেখেছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়টিতে আমাদের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শেষে প্রাপ্তি কতুটুকু সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের আলোচিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ২১৪ টি। মোট লেখকের সংখ্যা ৯২ জন। এই দীর্ঘ আলোচনায় আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশমান ধারাটিকে পর্যবেক্ষন করেছি, মূল্যায়ন করেছি। সবিনয়ে বলতে চাই এই ধরনের মূল্যায়ণ এই জেলাতেই বটেই, পশ্চিম বাংলার অন্য কোন জেলাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে পূর্ণতা দিতে হলে এই ধরনের জেলা ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন উপেক্ষা করা চলেনা। অনেক প্রচেষ্টা সত্বেও আমাদের অগোচরে কিছু তথ্য থেকে যেতে পারে। সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

আমার গবেষণা নির্দেশক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার মহাশয়ের সক্রিয় তত্বাবধানে এবং বহু লেখক-কবির, বিদ্যানুরাগী মানুষের সহযোগিতায় আমি এই গবেষণা নিবন্ধ প্রস্তুত করতে পেরেছি। এদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আশা করব আগামী দিনে এ ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান চলবে। সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আশিস কুমার নাহা

(আশিস কুমার নাহা)